IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

‘ভবিষ্যতের কবিতা’ : নন্দনতত্ত্বের নতুন দিগন্ত

ছোটন মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract: Professor Dr. Rameswar Shaw is mainly known as a linguist. However, apart from linguistics, he has written several essays on aesthetics. Pranjal Bengali translated ‘Bhobisyoter Kobita’, the world-renowned book on aesthetics by sage Sri Aurobindo as ‘The Future Poetry’. Aurobindo's language is generally idiosyncratic in expression and unintelligible in expression. With the help of his bodhi and meditation, Dr. Rameswar Shaw has introduced the Bengali readers to the profound and fundamental contemplative thought of Sri Aurobindo through his translated book entitled ‘Bhobisyoter Kobita’. Sri Aurobindo's profound knowledge of literature and aesthetics, direct familiarity with the ocean-wide world of mind and study and deep contemplation of the truth served up, complete command over the vocabulary of the Bengali language – above all Rameshwar Shaw’s deep respect for Sri Aurobindo and his wisdom, hard work and single-minded perseverance resulted in his ‘Bhobisyoter Kobita’, beauty has become, in Rabindranath's words, 'glory of daily living’ for the juice-thirsty Bengali.

Keyword : Beauty, Bodhi, Meditation, Philology, Aesthetics.

Discussion : ‘নন্দনতত্ত্ব’ বা ‘*Aesthetics*’ হল সুন্দর, সৌন্দর্য, আনন্দ অনুভব এসবের আলোচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান; যার বিকল্প শব্দরূপে কাব্যতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সৌন্দর্যশাস্ত্র, শিল্পতত্ত্ব, বীক্ষাশাস্ত্র, কান্তিবিদ্যা ইত্যাদি নামগুলো পাওয়া যায়। গ্রিক শব্দ ‘Aishtikos’ থেকে ‘Aesthetics’ শব্দটি এসেছে; যার অর্থ হল– অনুভব বা বোধ। ঈশ্বর বা বিশ্বপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ আর মানুষের শ্রেষ্ঠতার অভিজ্ঞানটি হল তার ‘মন’ (Mind)। সেই মনের ত্রিধা বৃত্তি— চিন্তা (Thinking), সংকল্প (Willing) ও অনুভব (Feeling)। মানবমনের এই ত্রিধা বৃত্তির মধ্যে ‘অনুভব’ বৃত্তিটি যেমন কোমল, সূক্ষ্ম তেমনি জটিল রহস্যময়। ড. রামেশ্বর শ’ তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি ‘সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা’ গ্রন্থে বলেছেন যে মানুষ—

> “এই বৃত্তিকে যখন সে চালিত করে সৌন্দর্যের পূর্ণরূপ সন্ধানে, তখন তার অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি উদ্বোধিত হয় এবং সে তখন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। তারই ফলশ্রুতি শিল্পসৃষ্টি।”[১]

বহু ভাষাবিদ্, সাহিত্য-সমালোচক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক রামেশ্বর শ’ মহামনীষী শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় লিখিত নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গগ্রন্থ ‘*The Future Poetry*’-র প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদ করেন ‘*ভবিষ্যতের কবিতা*’ নামে। শ্রীঅরবিন্দের রচনা প্রধানত ইংরেজিতে এবং শব্দ, দীর্ঘ বাক্য, প্রকাশভঙ্গি ও ভাব অত্যন্ত দুরূহ ও দুর্বোধ্য; যেখানে প্রবেশ করতে গেলেই বোধির সাহায্য নিতে হয়। রামেশ্বর শ’ অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য, গভীর মনোনিবেশের দ্বারা সেই অসাধ্য সাধন করেছেন। রামেশ্বর শ’ তাঁর নিজের বোধি ও মননের সাহায্যে সহজ, স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজিতে লিখিত নন্দনতত্ত্ববোধ ও অভিপ্রায়কে বাঙালি পাঠকের কাছে অতি সরসভাবে পরিবেশন করেছেন।

অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ’র জীবনের একটি বড় দিক ছিল তাঁর আকৈশোর শ্রীঅরবিন্দ অনুধ্যান। ১৯৫৬ সালে তিনি প্রথমবার পণ্ডিচেরি যান এবং সাহিত্য সমালোচনা ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ— ‘The Future Poetry’ নিয়ে আসেন এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে গ্রন্থটি পাঠ করেন। তারপর সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের গভীর জ্ঞান, মনীষা ও অধ্যয়নের সমুদ্র-বিস্তৃত জগতটির পরিচয় পেয়ে তিনি বিস্মিত হন এবং তখন তাঁর মধ্যে গ্রন্থটি অনুবাদ করার ইচ্ছে জাগে। এরপর ১৯৬৫ সালে ড. শ’ সাহিত্য একাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় সচিব পদের জন্য দিল্লি যান এবং সেখানে সুবিখ্যাত অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা হয় গ্রন্থটির অসাধারণত্ব নিয়ে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে ড. শ’-কেই অনুবাদে উৎসাহিত করেন। তারপর থেকেই শুরু হয় তাঁর এই অনুবাদের কাজ। গ্রন্থটি অনুবাদ করার কারণ হিসেবে অনুবাদক ড. রামেশ্বর শ’ বলেছেন—

> “বাঙালী পাঠক, সাহিত্যরসিক ও শিল্পতত্ত্ববিদ্ যাতে এক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের মৌলিকতম অবদানের সঙ্গে সহজে পরিচিত হতে পারেন সেইজন্যে আমি তাঁর গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করতে উদ্যোগী হই।”[২]

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের তৎকালীন সম্পাদক বহুভাষাবিদ্ সাহিত্য-সমালোচক মনীষী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত শ্রীঅরবিন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'শ্রীঅরবিন্দ-সাহিত্য-সংগ্রহ' গ্রন্থমালায় প্রকাশের জন্যে অনুবাদটি অনুমোদন করেন; কিন্তু নানা কারণে উক্ত গ্রন্থমালার প্রকাশ মধ্য পথে বন্ধ হয়ে যায়। পরে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশের ব্যবস্থা হলে জানা যায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গ্রন্থটি ইতিমধ্যে সংশোধন করেছেন, তখন অধ্যাপক শ' শ্রীঅরবিন্দ-কৃত সংশোধিত পাণ্ডুলিপির কপি এনে নতুন করে অনুবাদের কাজ শুরু করেন। ১৩৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র থেকে ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ পর্যন্ত 'শৃণ্বন্ত' পত্রিকায় অনুবাদটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৯৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ড. রামেশ্বর শ'র অনূদিত গ্রন্থটির নাম 'ভবিষ্যতের কবিতা' এটি স্থির করে দিয়েছিলেন তৎকালীন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক, বহুভাষাবিদ্, সাহিত্য-সমালোচক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত। ঋষি অরবিন্দ বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অতীতকে স্মরণে রেখে কবিতার যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, তা-ই এ গ্রন্থের মূল উপজীব্য। এই গ্রন্থ বাঙালি পাঠক ও সাহিত্য-রসিক মহলে শ্রীঅরবিন্দ-মনীষার পরিচয়ই শুধু নয়, সাহিত্যতত্ত্ব ও শিল্প জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে। শ্রীঅরবিন্দ-কৃত ইংরেজি ভাষায় লিখিত মূলগ্রন্থ 'The Future Poetry' প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত 'আর্য' নামে ইংরেজি মাসিক পত্রিকায়, ডিসেম্বর ১৯১৭ থেকে জুলাই ১৯২০ পর্যন্ত মোট ৩২টি কিস্তিতে। পরে সেটি ১৯৫৩ সালে প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় এবং তার পূর্ণাঙ্গ সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। আর এই সংস্করণ-ই বাংলা অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ' 'ভবিষ্যতের কবিতা' নামে।

মহামনীষী শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় লিখিত নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ '*The Future Poetry*'। তাঁর এই গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে একটি ইতিহাস আছে। আইরিশ কবি-সমালোচক James Cousins-এর 'The New Way in English Literature' শীর্ষক গ্রন্থটি 'আর্য' পত্রিকায় সমালোচনার জন্য তাঁর কাছে আসে এবং তিনি সমালোচনা লেখা শুরু করেও তা অসমাপ্ত রাখেন, কারণ তিনি নিজে এমন একটি বড় বই লিখতে চেয়েছিলেন যার মধ্যে তিনি শিল্প ও জীবন সম্বন্ধে নিজের ধ্যান-ধারণাগুলো প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং James Cousins -এর বইটিই ছিল এক অর্থে শ্রীঅরবিন্দের 'The Future Poetry' লেখার প্রেরণা-উৎস। কাজিন্সের ১৩৫ পৃষ্ঠার ছোট্ট বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে এবং তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। বইটি মূলত আইরিশ ও ইংরেজদের নিয়ে লেখা হলেও রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি এবং শ্রীঅরবিন্দের কবিতা নিয়ে দুটি পরিচ্ছেদ তাতে ছিল; এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন এবং অনেকদিন পর পর লেখা হলেও শ্রীঅরবিন্দ বইটিকে মূল্যবান মনে করেছিলেন—

> "এটি এমন এক চিন্তার জন্ম দেয় যা লেখকের নির্দিষ্ট বিষয়-সীমাকেও অতিক্রম করে যায় এবং আমাদের জীবনে যে নতুন যুগটি আসছে তার কাব্যের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত সামগ্রিক সমস্যাটিরই ইঙ্গিত দেয়।"[৩]

আসলে কাজিন্সের উক্ত গ্রন্থে একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল সেটি হল সমগ্র বিশ্বের কাব্য সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কী? এবং সে বিষয়ে একদিকে ইংরেজি সাহিত্য অন্যদিকে ভারতীয় মন ও ভারতবাসীর নিজস্ব ধাত কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে? কাজিন্সের এই বইটির রূপরেখা সামনে রেখে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মৌলিক বিচার-বিশ্লেষণের অনুপুঙ্খতায়, ভবিষ্যতের কবিতা বিষয়ক প্রস্তাবগুলি এখানে তুলে ধরেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর 'The Future Poetry' গ্রন্থ-সমালোচনার উপলক্ষকে ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা, দার্শনিক কবির কাব্য-চিন্তার ফসল। সাহিত্য-সমালোচনা ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্ববিখ্যাত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ' 'ভবিষ্যতের কবিতা' নামে।

রামেশ্বর শ' অনূদিত **'ভবিষ্যতের কবিতা'** শীর্ষক গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত— পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ। প্রথম ভাগে আছে ২৪টি এবং শেষভাগে আছে ৮টি অধ্যায়। মোট ৩২টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সম্পন্ন। গ্রন্থ শেষে তিনটি পরিশিষ্ট আছে এছাড়া আছে সম্পাদকের বিবৃতিসহ উদ্ধৃতির সারণি। সমগ্র গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩০। এ গ্রন্থের বিষয় বিশ্বসাহিত্য। গ্রন্থের প্রথমার্ধে মন্ত্র, কাব্যের আত্মা, ছন্দঃস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ, রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু, কবির সূক্ষ্মদর্শন ও মন্ত্র, কাব্যের জাতীয় বিবর্তন, ইংরেজি কাব্যের প্রকৃতি ও ধারা, আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি, ভোরের পাখি, ভিক্টোরীয় কবিবৃন্দ ও সাম্প্রতিক ইংরেজি কাব্যের প্রতিভাবান কবিদের কবিকর্ম ও কবিধর্মের বিশ্লেষণ করেছেন এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে এসে প্রশ্ন রেখেছেন এটা নবজন্ম, না অবক্ষয়? পূর্বার্ধের দীর্ঘ আলোচনার শেষে উত্তরার্ধে এসে পূর্বার্ধের সংশয় ও প্রশ্নের সত্যান্বেষণে 'বোধি'র আলোকে স্থির সিদ্ধান্তে উন্নীত হয়েছেন। *কবিতার আদর্শ ভাব, কাব্য-সত্যের সূর্য, মহত্তর জীবনের স্পন্দন, কাব্যিক আনন্দ ও কাব্যিক সৌন্দর্যের আত্মা, আত্মার শক্তি, কাব্যের আত্মা ও রূপবন্ধ, বাণী ও আত্মা* ইত্যাদি শিরোনামে কবিতার ভবিষ্যৎ প্রকৃতি কী হবে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রথম ভাগের কিছু প্রবন্ধ এবং শেষভাগের সব লেখাগুলিরই উপজীব্য নন্দনতত্ত্ব।

'ভবিষ্যতের কবিতা'-র প্রতিটি প্রবন্ধ-ই যেন একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। গ্রন্থের প্রথম রচনা—**'মন্ত্র'**। এখানে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গ্রন্থ রচনার প্রেরণা-উৎস শ্রীযুক্ত James Cousins-এর *'New Way in English Literature'* গ্রন্থের কথা বলেছেন; যেটি সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ গভীর মনোসংযোগী হয়ে পড়েন এবং তাঁর মধ্যেও শিল্প, জীবন বোধ ও বোধির প্রতিফলন ঘটে। আসলে কাজিন্সের গ্রন্থের মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে উত্থাপিত হয়েছিল যে প্রশ্নটি— ইংরেজি কাব্যের তথা সমগ্র পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ কী হবে? এরই উত্তরার্ধে শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্বগভীর মৌলিক মনন ঋদ্ধ চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে এবং যার ফলশ্রুতি হল এই ভবিষ্যতের কবিতা। এখন যে সমস্যাটির কথা তিনি বলেছেন সেটি হল—

> "কোন্ মহত্তর করণীয় রয়েছে ভবিষ্যতের কবিতার সামনে, — যা এখনো পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন হয়েছে অত্যল্পই — এবং সেই নতুন প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে একদিকে ইংরেজি সাহিত্য, অন্যদিকে ভারতীয় মন ও ভারতবাসীর নিজস্ব ধাত।"[৪]

শ্রীঅরবিন্দ এই সমস্যারই সমাধানের পথ অন্বেষণ করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন কালপর্বের সাহিত্যিকদের রচনার পরিচয় দিতে দিতে তিনি মানবচিন্তার অগ্রগতির ধারাটি খুঁজে নেন এবং সেই আলোকে ভবিষ্যতের কবিতার স্বরূপটি চেনার চেষ্টা করেন। কবিতা মানসিক বিষয় হলেও তাতে শোনা যায় দূরাগতের আহ্বান। তাই কবিতাকে তিনি মন্ত্র রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> "যাকে আমরা 'মন্ত্র' বলি তার সঙ্গে কাব্যের একটা ক্রমবর্ধমান সান্নিধ্যের আবিষ্কার। বেদ বলেন, মন্ত্র অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বাক্ উত্থিত হয় যুগপৎ ঋষির অন্তঃকরণ থেকে এবং সত্যের দূরতম পীঠস্থান থেকে। কাব্য আবিষ্কার করবে সেই বাক্-কে, সেই দিব্যগতিকে, সত্যের উপযুক্ত সেই চিন্তারূপকে।"[৫]

'ভবিষ্যতের কবিতা' গ্রন্থের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় রচনাটি হল—**'কাব্যের আত্মা'**। সাহিত্যতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্বে ভারতীয় আলংকারিকদের মতাদর্শ অনুযায়ী বহু উচ্চারিত একটি প্রশ্ন— কাব্যের আত্মা কোথায়? এই দেহ বা আত্মার সন্ধানে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মতবাদের। এক্ষেত্রে পরম্পরা বিকশিত দুটি মতবাদ হল— দেহবাদী ও আত্মাবাদী মতবাদ। দেহবাদীদের মতে, কাব্যের আত্মা ব্যবচ্ছেদ করে পাওয়া যায় না; তা অনুসন্ধান করতে হয় দেহের অতীত কোনো ভুবনে। কিন্তু আত্মাবাদীদের মত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এই মতের বিপরীত। তাঁরা মনে করতেন, মহৎ কাব্য মাত্রেরই একটি দেহসুষমা আছে এবং সেই কায়াসৌন্দর্য কাব্যের আত্মা। শব্দ, অর্থ, ধ্বনি, অলংকার প্রভৃতি উপাচারে সজ্জিত কাব্যই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক ভাবনার সঙ্গে পাঠকের কোনো কোনো বিষয়ে মত পার্থক্য ঘটতে পারে কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণী-প্রতিভা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিকে অস্বীকার করা যায় না। শ্রীঅরবিন্দের মতে, কাব্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার শিল্পরূপের আত্মিক-মূল্যে, আর কাব্যের শরীরী আয়োজনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় ও উপকরণ মাত্র। কাব্যরীতির সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে তিনি গদ্যরীতির কথাও বলেছেন। পদ্যরীতিতে ব্যবহৃত হয় মূলত যতি আর গদ্যরীতিতে ছেদ। গদ্য অন্বয় ও অর্থনির্ভর, ছন্দস্পন্দ নয়, বাক্স্পন্দনই গদ্যরীতির প্রধান অবলম্বন। এই বাক্স্পন্দ আটপৌরে, সাধারণ গদ্যকে কবিতার গতিময় গদ্যে রূপান্তরিত করে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেন 'গদ্যে পদ্যের রঙ ধরানো'। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন—

> "গদ্য যদি প্রকরণের ক্ষেত্রে আরো আকর্ষণীয় ছন্দঃসুষমার দিকে এগিয়ে যায়, সূক্ষ্মদর্শনের প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে চিত্রকল্পের ব্যবহার করে, ভাষার বলবত্তর প্রাণশক্তির দিকে নিজেকে খুলে ধরে, তাহলে গদ্যশৈলী তার নিজের স্বাভাবিক এলাকা ছাড়িয়ে কাব্যপরিধির দিকে পা বাড়ায়।"[৬]

'ছন্দঃস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ' শীর্ষক রচনার মূল বিষয় শিল্পকর্মের সাম্য। ইংরেজি 'Rhythm' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'ছন্দঃস্পন্দ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কবি ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। গতি আর বিরতিজাত উত্থান-পতনময় তরঙ্গ ভঙ্গিকেই বলে ছন্দঃস্পন্দ। ছন্দ মানুষের ভাষা নির্ভর এমন এক নির্মাণ— যা কথার মধ্যে ছড়িয়ে দেয় সুরের স্পন্দন। সুষমধ্বনি প্রবাহেই উৎপন্ন হয় এই স্পন্দন। শুধু ধ্বনি নয়, নৈঃশব্দ ও বিরামের সুশৃঙ্খল বিন্যাসেও এই স্পন্দন সৃষ্টি হতে পারে। আর সেই স্পন্দনই কানের ভেতর দিয়ে আমাদের মর্মে প্রবেশ করে কবিতা আস্বাদের পথ প্রশস্ত করে দেয়। শ্রীঅরবিন্দ কাব্য বাণীর ত্রিবিধ তীব্রতার কথা বলেছেন—

(১) ছন্দোময়গতিপ্রবাহের সর্বাধিক তীব্রতা,
(২) রচনাশৈলীর সর্বাধিক তীব্রতা এবং
(৩) অন্তরাত্মার সত্যদর্শনের সর্বাধিক তীব্রতা।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, এই তিন উপাদানের ঐকতানেই সৃষ্টি হয় মহৎ শিল্পকর্মের। তাঁর মতানুসারে—

> "সমস্ত মহৎ কাব্যের জন্ম এই তিন উপাদানের ঐকতান থেকে। এদের মধ্যে যেকোন একটির ঘাটতি হলে এমনকি মহত্তম কবিদের শিল্পকর্মেও অসাম্য দেখা দেয়। যেকোন একটি উপাদানের ব্যর্থতাই তাঁদের স্খলনের, তাঁদের সৃষ্টিতে খাদ-মিশ্রণের এবং তাঁদের চন্দ্রের বুকে কলঙ্কের কারণ হতে পারে। অন্যপক্ষে, এই ত্রিবিধ যখন দ্রবীভূত একীভূত হয়ে কোন এক উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়, কেবল তখনি তা থেকে মন্ত্রের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।"[৭]

এই ত্রিবিধ উপাদানের মধ্যে কাব্যের প্রাথমিক মৌলিক অপরিহার্য উপাদানটি হল ছন্দঃস্পন্দন ও গতিপ্রবাহ। শ্রীঅরবিন্দের মতে, যে সৃষ্টিতে কবির সূক্ষ্মদর্শন খুবই কম এবং রচনাশৈলীর উচ্চতর তীব্রতা থেকে যা বহুদূরে, নিখুঁত ছন্দঃস্পন্দন সেই সৃষ্টিকেও প্রায় অমরত্ব দান করতে পারে। আর কাব্যের গতিপ্রবাহের তীব্রতা থেকে কাব্যিক প্রকাশভঙ্গির মহত্তর সম্ভাবনার সূচনা হয়। প্রসঙ্গত তিনি কবি মিল্টন, হুইটম্যান, কার্পেন্টারের কথা বলেছেন। কবি হিসেবে মিল্টন সাফল্যলাভ করলেও তাঁর সৃষ্টির জগতে অপূর্ণতা লক্ষণীয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে মিল্টন তাঁর অন্তরাত্মার সত্যাদর্শের তীব্রতা সৃষ্টি করতে পারেননি। হুইটম্যান ও কার্পেন্টারের সীমাবদ্ধতার মূলে আছে ওই ছন্দোময় গতিপ্রবাহের তীব্রতার অভাব এবং একই অসাম্য লক্ষ করা যায় ভিক্টোরীয় কবিদের ক্ষেত্রেও।

'রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু' প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ গুরুত্ব আরোপ করেছেন মূলত কবিভাষার উপর। শ্রীঅরবিন্দের মতে, কাব্যভাষা ও কাব্যবিষয় অভিন্ন। কবির মুখ্য দায়িত্ব রঙে-রূপে-বৈচিত্র্যে প্রকাশিত প্রকৃতির মতোই নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করা। ফলে অনুভূতি আত্ম-উপলব্ধিপূর্ণ ও সমগ্র না হলে কবিতার শৈলীও পরিপক্কতা পায় না।

'কবির সূক্ষ্মদর্শন ও মন্ত্র' শীর্ষক নিবন্ধে কবির জীবনদৃষ্টির স্বতন্ত্রতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজি শব্দ 'Poet'-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'কবি', যা প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী সত্যের দ্রষ্টা এবং প্রকাশক। শ্রীঅরবিন্দও সেই বৈদিক ঐতিহ্যেই কবিকে 'দ্রষ্টা' বলে মেনে নিয়ে বলেছেন—

> "সূক্ষ্মদর্শনই হল কবির নিজস্ব বিশিষ্ট শক্তি, যেমন নিত্যানিত্য বস্তু-বিচার হল দার্শনিকের প্রকৃতিদত্ত স্বরূপ-ধর্ম এবং বিশ্লেষণধর্মী পর্যবেক্ষণ হল বৈজ্ঞানিকের প্রকৃতিগত প্রতিভা।"[৮]

দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর সঙ্গে কবির পার্থক্য এই সূক্ষ্মদর্শনজাত উপলব্ধির। দার্শনিক জগৎ ও জীবনকে বিচার করেন প্রকৃতিদত্ত স্বরূপ-ধর্মের আলোকে, আর বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করেন তাঁর বিশ্লেষণী-চেতনার সাহায্যে। কিন্তু কবির সূক্ষ্মদর্শনে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি একই সমতলে অবস্থান করে বলে প্রতিভা হিসেবে কবিই শ্রেষ্ঠ এবং সব মহৎ কবিই যুগপৎ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী।

'কাব্যের জাতীয় বিবর্তন' রচনায় শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় কাব্য রচনা ও বিবর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন যে, জাতীয় কাব্য রচনার জন্য একটি সময় ও আয়োজনের প্রয়োজন; কিন্তু এই বিশেষ শর্ত পূরণ হওয়ার পরও অনেক সময় জাতীয় কাব্য রচিত হয় না। বস্তুত এ কাজ তখনই সম্ভবপর হয়, যখন জাতির সব লোক না হলেও অন্তত কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে অতীত অধ্যাত্ম-চেতনা ও আত্মদর্শন জাগ্রত ও বিকশিত হয়। কাব্যের এই জাতীয় বিবর্তন সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত—

> "কাব্যের জাতীয় বিবর্তন এবং তার সঙ্গে কবি ও তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ককে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে আমাদের যে চেষ্টা, সেটা সফল হতে বাধ্য, যদি আমরা সেগুলিকে কাব্য-বহির্ভূত জিনিসের দৃষ্টিতে না দেখে বরং দেখি কাব্যের নিজের আত্মা, তার বিশিষ্ট ভাব ও রূপের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।"[৯]

ইংরেজি কাব্যের বিবর্তনের ধারায় আদি পর্ব থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ইংরেজি কবি-কাব্য ও ধর্ম বিশ্লেষণ করে পূর্বার্ধের শেষে 'নবজন্ম, না অবক্ষয়?' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ একটি প্রশ্ন বা সংশয় রেখেছেন। সেটি হল— কাব্যের এই বিবর্তন কী নবজন্মের ইঙ্গিত দিচ্ছে? না অবক্ষয়ের বার্তা বহন করে নিয়ে আসছে? শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, একমাত্র ইংরেজি কাব্য-ই কাব্যের উৎসস্থানীয় মূলভাব, কাব্যের আত্মার ঊর্ধ্বগতির পথে মূল প্রেরণাকে প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু তিনি এটাও বলেছেন যে, ইংরেজি কাব্য অন্তরাত্মার নান্দনিক অভিব্যক্তির যতই পরিচয় দিক না কেন, তার মধ্যে বুদ্ধিবাদের চরম বিকাশের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রবল প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। আর এটাই হচ্ছে তার অবক্ষয়ের দিক। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন—

> "বুদ্ধিবাদ যদি তার সীমার বাইরে এগিয়ে যেতে নাই পারে, তাহলে তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে তার অবদান যা-ই থাক না কেন, একটা কাব্যিক অবক্ষয়ের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি হতে বাধ্য। এবং বুদ্ধি যতই আমাদের জীবনের অন্যান্য বৃত্তিকে দাবিয়ে রাখবে, ততই এই অবক্ষয় ঘনিয়ে আসবে।"[১০]

শ্রীঅরবিন্দ বলেন এই অবক্ষয়ের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আগে থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। একটা শৈল্পিক অবক্ষয় যে আসন্ন এবং সেই অবক্ষয়কে ধরবার জন্য তার চিহ্নগুলিকে নবসৃষ্টির মধ্যে, কলা ও কাব্যের নতুন দিক পরিবর্তনের মধ্যে অনুসন্ধান করার যে একটা প্রবল প্রবণতা— তা ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র শেষভাগ জুড়েই চোখে পড়ে। এক সময় তো এমনই নির্মম ভবিষ্যৎ-বাণী করা হয়েছিল যে, আধুনিক মন যেভাবে ক্রমশ ধীরে ধীরে অধিকতর পরিমাণে বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছে এবং দিন দিন তার কাব্যিক মন ও সৌন্দর্যরসিক-কল্পনা হ্রাস পাচ্ছে, তাতে অপরিহার্য নিয়মে কাব্যের পতন হতে বাধ্য; বিজ্ঞানের জন্য তাকে আসন ছেড়ে দিতেই হবে। আধুনিক মন যে নতুন পথ নিয়েছে তার পরিণাম হবে একটা ঊর্ধ্বতর সভ্যতার মনন ও জীবন। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে, মানব-মনীষা আজ বুদ্ধিগত মানসিকতার মধ্য দিয়ে একটা বোধিচেতন মানসিকতায় উত্তরণের সাধনা শুরু করতে চলেছে। বুদ্ধিকে এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবতার জগৎকেই সব কিছু বলে মেনে নিয়ে সে আর খুশি নয়, বুদ্ধিগত যুক্তিকে সে জীবন ও আত্মার মধ্যে যোগাযোগের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে সে আর সন্তুষ্ট নয়, বরং সে অনুভব করতে শুরু করেছে যে, আধ্যাত্মিক মন বলেও একটা কিছু আছে এবং সেই মনই একটা মহত্তর ব্যাপকতর দিব্যদর্শনের দ্বারে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম উন্মোচনই হুইটম্যান, কার্পেন্টার এবং রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস এবং মেরিডিথ ও অন্য কয়েকজন ইংরেজ কবির সৃষ্টির মূল তাৎপর্য। কিছু সমালোচক এঁদের কাব্যের মধ্যে দেখতে পান এক বিষণ্ণ আলো— তা কী অবক্ষয়ের চিহ্ন? এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, শুধু পুঁথিগত তথাকথিত নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এর সমাধান করা সম্ভব নয়, সত্যান্বেষণ বোধি চিত্তের আলোকে এই প্রশ্ন বা সংশয়ের অবসান হয়তো ঘটানো যেতে পারে; কিন্তু এ যেন অনেকটা দূর হতে সমুদ্রতট দেখার মতো ক্ষীণ ও ম্লান।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, ভবিষ্যতের কাব্য হবে আরো সার্থকভাবে বোধিলব্ধ, বর্তমানের ভ্রূণাবস্থা থেকে সাফল্যের সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়ে তা আত্মসচেতন হয়ে উঠবে এবং নিজের সমস্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতার পারস্পরিক তড়িৎস্পর্শে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এবং দুইয়ের মিলন থেকেই জন্ম নেবে ভবিষ্যতের কবিতা। এমন প্রত্যয়েই তিনি স্থির হয়েছেন—

> "নতুন যুগের এই কাব্যের সামনে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই তার বিষয়বস্তুরূপে উন্মোচিত হবে— ঈশ্বর, প্রকৃতি, মানুষ এবং সমস্ত লোক-লোকান্তর, সীমা এবং অসীমের রাজ্য, — সবই তার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। কোন পরিসমাপ্তি নয়, এমনকি কোন মহান পরিসমাপ্তিও নয়, কোন একটিমাত্র ক্ষেত্রে এসে ফুরিয়ে যাওয়াও নয় — ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে যা তুলে ধরে তা হল বরং একটা নতুনতর ঊর্ধ্বতর অনন্ত ক্রমবিকাশ, মানুষের শক্তি ও সত্তার, তার কর্ম ও সৃষ্টির এক দ্বিতীয় জন্ম, এক মহত্তর জন্মান্তর।"[১১]

'ভবিষ্যতের কবিতা' গ্রন্থটির পূর্বার্ধের দীর্ঘ আলোচনা শেষে যে প্রশ্ন বা সংশয় উত্থাপিত হয়েছে, গ্রন্থটির উত্তরার্ধে এসে তা যেন এক স্থির প্রত্যয়ে উন্নীত হয়েছে। উত্তরার্ধের প্রথম প্রবন্ধ **'কবিতার আদর্শ ভাব'** শীর্ষক রচনায় ভবিষ্যতের কাব্য কেমন হবে তার ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে, সত্য, জীবন, সৌন্দর্য, আনন্দ ও আত্মা –এই পাঁচটি শাশ্বত শক্তির মধ্যে মানসসৌন্দর্যকে ধ্বনিত করাই আদর্শ কাব্য। আর এই সবই আসে বোধি থেকে। আধুনিক যুগে যে সব কবির কাব্যে এইসব লক্ষণগুলি স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কাব্য সত্য, সৌন্দর্য ও আনন্দের রূপরচনা। কবিতার রূপ বদলে যেতে পারে, কিন্তু কবিতার আত্মা শাশ্বত। আধুনিক মন জীবনের উপরে, মানবতার উপরে, আমাদের কর্ম ও পরিশ্রমের মর্যাদার উপরে জোর দেয় এবং এটাকে শ্রীঅরবিন্দ অযৌক্তিক মনে করেননি। তিনি বলেছেন—

> "কাব্য তখনই নিজেকে একান্ত করে আবিষ্কার করবে এবং তার ঐতিহ্যের নিজস্ব ধারায় পুরোপুরি ফিরে আসবে, যখন সে এই পাঁচটি জিনিসের মধ্যে সমৃদ্ধতম সামঞ্জস্যে এসে উপনীত হবে এবং সেই সামঞ্জস্যে থাকবে তাদের পর্যাপ্ত মাধুর্য, জ্যোতি ও শক্তি। কিন্তু সেটা কেবল তখনই পুরোপুরি সম্ভব, যখন কাব্য সূক্ষ্ম-দর্শনের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে গান ধরবে এবং আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপকতম বিস্তৃতির মধ্যে পক্ষবিস্তার করবে।"[১২]

ভবিষ্যতের কাব্যের পাঁচটি সূর্যের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের মতে, সত্য হল কবি সৃষ্টিকর্মের অন্যতম অধিষ্ঠাত্রী শক্তি এবং তাঁর ঈশ্বর দেবতা জ্যোতি হল এমন এক দিব্যতর সূর্যালোক যার মধ্যে দাঁড়িয়ে কবি জগতকে দেখেন এবং তার জ্বলন্ত শিখাটির সাহায্যে নিজের ভিতরে ও বাইরে তাঁর সৃষ্টির অগ্নিশিখাটিকে জ্বালিয়ে নিতে পারেন। শ্রীঅরবিন্দ জানাচ্ছেন—

> "কাব্যের কাজ হল কোন বিশেষ ধরনের সত্যের শিক্ষাদান নয়, আদৌ কোন শিক্ষাদানই নয়, জ্ঞানের তপস্যাও নয়, কিংবা কোন ধর্মীয় বা নৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধিও নয়, বরং সৌন্দর্যকে বাণীমূর্তি দান করা এবং আনন্দবিধান করা।"[১৩]

'মহত্তর জীবনের স্পন্দন' শীর্ষক নিবন্ধে জীবন শক্তির কথা বলা হয়েছে। জীবন এগিয়ে চলে 'নিয়তি নির্দিষ্ট অতিমানুষের' দিকে। জীবনের একমাত্র সার্থকতম উদ্দেশ্য হল 'হয়ে ওঠা'; যা আছে এটাই শেষ নয়, সব মনের গ্রন্থি খুলতে খুলতে আমাদের অগ্রগমন। এই চলার আনন্দেই জীবনের সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

> "কবির সৃষ্টিতে যে শক্তি আলো দেখায় সেটি হল তাঁর সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন, আর যে শক্তিটি তাকে চালিয়ে নিয়ে যায় সেটা হল সৌন্দর্য ও আনন্দের আবেগ; কিন্তু যেটি তাঁর সৃষ্টিতে স্থায়ী শক্তিসঞ্চার করে, যে শক্তি তাকে মহান্ ও প্রাণবান্ করে তোলে সেটি হল জীবনের স্পন্দন।"[১৪]

সমস্ত মহৎ কাব্যসৃষ্টির মূলে থাকে জীবনকে ধরে ঊর্ধ্বায়িত করা, তাকে মধুময় ও জ্যোতির্ময় করে তোলা। আসলে কাব্য হল জীবনেরই ছন্দিত বাণী; কিন্তু তা হল জীবনের অন্তরের বাণী, উপরিতলের বাণী নয়। কবি তাঁর সৃষ্টিতে অন্তরতম সত্যকে যতই প্রকাশ করে ধরেন ততই তাঁর সৃষ্টি মহৎ হয়ে ওঠে।

কাব্যকে অমরত্ব ও পরিপূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে সত্যের আলো, জীবনের স্পন্দন ছাড়াও আর যেটি প্রয়োজন তা হল কাব্যিক আনন্দ ও সৌন্দর্য। কবির কাছে এই আনন্দ ও সৌন্দর্য হল সত্যের সূর্য বা জীবনের স্পন্দনের চেয়েও মহত্তর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। **'কাব্যিক আনন্দ ও কাব্যিক সৌন্দর্যের আত্মা'** শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কাব্যিক আনন্দ বলতে বুঝিয়েছেন যে, আনন্দ হল সৃষ্টির আত্মা, আর সৌন্দর্য হল তার তীব্র ভাবচ্ছবি, আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "এই যুগ্ম শক্তি মিলিত হয়ে কবি-শিল্পীর সৃষ্টিতে একটা পূর্ণ সৌষম্যের ঐকতান রচনা করে— এরাই হল কবির দুই আদি ইষ্ট দেবী, আর অন্যরা শুধু এই দুই ইষ্ট দেবীকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়, আনন্দের অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে, সৌন্দর্যের সুযোগটি গ্রহণ করতে চায়, এবং সৌন্দর্য ও আনন্দের সঙ্গে একটা অলঙ্ঘ্য আকর্ষণীয় একাত্মতায় মিশে যাবার জন্যে তাদের স্বীকৃতিলাভের চেষ্টা করে।"[১৫]

সৌন্দর্য ও আনন্দ হল কাব্য ও শিল্পের আত্মা ও উৎস। মানুষ বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিদান করাতে এবং তার জীবনে সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলাতেই কাব্য ও শিল্পের পরম তাৎপর্য।

শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যতের কাব্যের মধ্যে মানস-সৌন্দর্যকে ধ্বনিত করার যে শাশ্বত পঞ্চশক্তির সম্মিলিত অভিপ্রকাশের কথা বলেছেন তার মধ্যে শেষ শক্তিটি হল আত্মার শক্তি। **'আত্মার শক্তি'** নামক প্রবন্ধের শুরুতেই শ্রীঅরবিন্দ জানাচ্ছেন—

> "সোজাসুজি আত্মার শক্তি থেকে যে কাব্যের জন্ম এবং আত্মারই শক্তিতে যে কাব্য পরিপূর্ণ, সেই কাব্যই হল মানবজাতির অন্তরাত্মা এবং তার চিত্তের ব্যাপকতম ও গভীরতম আত্মপ্রকাশ।"[১৬]

এই কাব্যেরই অন্বেষণ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ এবং তিনি স্থির প্রত্যয়ে বিশ্বাসী যে, ভবিষ্যতের কবিতা এই আত্মার শক্তি থেকেই উৎসারিত হবে এবং তা হবে শাশ্বত সত্যের বাণীবহ, নশ্বর জীবনের বিচিত্র ঘটনা, আবেগ ও ক্ষণভঙ্গুর নানা বিষয়ও হবে একটা নতুনতর তাৎপর্যে মণ্ডিত।

কাব্যের আত্মার যে বিবর্তন ঘটে, তা তার রূপবন্ধের মধ্যেও অনিবার্যভাবে একটা পরিবর্তন নিয়ে আনে। **'কাব্যের আত্মা ও রূপবন্ধ'** শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ সেই রূপবন্ধের পরিবর্তনেরই কথা বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে, এই পরিবর্তন বোধিলব্ধ এবং সত্য প্রকাশক কাব্যের সৃজনশীল মনের শুধু উন্মোচন ঘটাবে তা নয়, পুরাতন সব রূপবন্ধকে ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন নতুন ছাঁদ সৃষ্টি তো করবেই কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধিত হবে পুরাতন আধারের মধ্যে নতুন নতুন সম্ভাবনার বিকাশের ফলে এবং তাদের চরিত্রের একটা অন্তরতর সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ফলে আর এটা আরও হবে বিশেষ করে সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে একটা প্রস্তুতির সাধনা সেই দিক থেকে পুরাতনের অল্পস্বল্প পরিমার্জন করে তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার একটা প্রবল প্রয়াস। পরিবর্তিত রূপবন্ধ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য—

> "শুধু নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজানো তো যথেষ্ট পরিবর্তন নয় বলেই মনে হচ্ছে, সম্পূর্ণ নতুন একটি আত্মার জন্যে একেবারে নতুন একটি দেহই সৃষ্টি করা —এই হল আজকের প্রত্যাদিষ্ট আবিষ্ক্রিয়া এবং সাধনা।"[১৭]

কাব্যের বিবর্তনের ফলে শুধু তার রূপবন্ধ বা কাঠামোকেই প্রভাবিত করে না, তার বাণী ও ছন্দঃপ্রবাহের মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন সূচিত হয়। **'বাণী ও আত্মা'** প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

> "কাব্যের বাণী হল আত্মারই একটা বাহন, অন্তরাত্মারই আত্মপ্রকাশের একটি নির্বাচিত মাধ্যম।"[১৮]

ফলতঃ এই পরিবর্তনের মূল নিয়ামক ভাব এবং এর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়টা আরো নিবিড়, আরো পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ বোধিলব্ধ বাণী ও ছন্দ স্পন্দনের দিকে ঘোরা।

'উপসংহার' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। এখানে শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজি কাব্যের রূপরেখা ও নান্দনিক চেতনার আলোকে ভবিষ্যৎ কাব্যের যে বাণী বা প্রস্তাব রেখেছেন, তার সমস্যা ও সমাধানের পথ খুঁজেছেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্য মানসিকতার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানসিকতার মধ্যে একটির রয়েছে বিরাট একটা আধ্যাত্মিক মন এবং এমন একটি অন্তর্মুখী দৃষ্টি যা আত্মিক স্বরূপ ও শাশ্বত সত্যের দিকে ঘোরানো আর অন্যটির রয়েছে চিন্তার স্বাধীন অন্বেষণ এবং প্রাণশক্তির এক দুর্দম সাহস যা পৃথিবী ও তার সমস্যাবলীকে ক্রমে ক্রমে জয় করে চলেছে। এখন এই দুই মানসিকতার মধ্যে যার যে সম্পদই থাক না কেন, এই দুই এসে পরস্পরকে স্পর্শ করবে এবং দুয়ের এই পারস্পরিক তড়িৎস্পর্শেই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে এবং দুয়ের মিলন থেকেই জন্ম নেবে ভবিষ্যতের কবিতা। মানুষের নিজের সম্পর্কে, প্রকৃতি ও জগত সম্পর্কে একটা নতুনতর মহত্তর দিব্যদৃষ্টি এসে মিলিত হবে আমাদের জীবন ও ভাবধারার মধ্যে আর এটাই হল ভবিষ্যতের কবিতার পরিপূর্ণতার শর্ত। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, বিশ্বদৃষ্টি অর্জন করতে না পারলে, মানুষের মধ্যে এবং ইহজগতের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি না ঘটালে ভবিষ্যতের কবিতা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে দৃষ্টিদান করবে, শৈল্পিক সৌন্দর্যরূপ দেবে, তার প্রকাশের ভাষা দেবে এবং এই ভাবে জীবনের এই ঊর্ধ্বায়নই হবে আগামী দিনের কবিতার উপজীব্য। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য—

> "বিশ্বদৃষ্টি, মানুষের মধ্যে এবং ইহজগতের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি, মানুষের দিব্য-সম্ভাবনার এবং মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রকাশিত শক্তির মহিমার উপলব্ধি। এ হল মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, বোধ ও কর্মের আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্বায়ন, চৈত্যাশ্রয়ী মন ও হৃদয়ের অধিকতর বিকাশ, মানুষের আপন প্রকৃতি ও জগতের তাৎপর্য সম্পর্কে তার একটা সত্যতর গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ, আরো দিব্য সব সম্ভাবনা, আরো আধ্যাত্মিক সব মূল্যবোধকে মানুষের জীবনের বর্তমান অভিপ্রায় ও বর্তমান কাঠামোর মধ্যে আবাহন। মানবজাতির কাছে বিশ্ববিধাতার এই হল দাবি।"[১৯]

বিশ্ববিধাতার এই দাবিকে যেসব জাতি তাদের জীবন ও সংস্কৃতির অঙ্গ করে নেবে এবং বাস্তবরূপ দান করবে, তারাই হবে আগামী ঊষালগ্নের নতুন জাতি। আর যে-সব কবি তাঁরা যে-কোনো ভাষার এবং যে-কোনো জাতিরই হোন না কেন— সম্পূর্ণরূপে এই দিব্যদৃষ্টি নিয়ে দেখতে পারবেন এবং তারই অভিব্যক্তির প্রেরণায় কথা বলবেন, তাঁরাই হবেন ভবিষ্যতের কবিতার স্রষ্টা।

মহামনীষী শ্রীঅরবিন্দের তত্ত্বগভীর মৌলিক মনন ঋদ্ধ সূক্ষ্ম উপলব্ধির চিন্তাধারা বা এই নন্দনতত্ত্ববোধ ও অভিপ্রায়কে অনুবাদ করা সহজ কাজ নয়; ড. রামেশ্বর শ' কঠোর শ্রমে নিজের বোধি ও মননের সাহায্যে তা বাংলায় অনুবাদ করে ভবিষ্যতের কবিতার স্বরূপই শুধু জানিয়ে দিলেন না, নন্দনতত্ত্বের সামগ্রিক তথ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে সৌন্দর্য রস-পিপাসু বাঙালি পাঠক-সমাজে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১। শ', রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫
২। শ্রীঅরবিন্দ, *ভবিষ্যতের কবিতা* ('The Future Poetry'-গ্রন্থের রামেশ্বর শ' কৃত-অনুবাদ), শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি, ১৯৯৫, পৃ. অনুবাদকের কথা
৩। তদেব, পৃ. ৩
৪। তদেব, পৃ. ৩
৫। তদেব, পৃ. ১২
৬। তদেব, পৃ. ১৯-২০
৭। তদেব, পৃ. ২২
৮। তদেব, পৃ. ৩৬
৯। তদেব, পৃ. ৫৫
১০। তদেব, পৃ. ২৫১
১১। তদেব, পৃ. ২৫৭
১২। তদেব, পৃ. ২৭০
১৩। তদেব, পৃ. ২৮৬
১৪। তদেব, পৃ. ২৯২
১৫। তদেব, পৃ. ৩০৭
১৬। তদেব, পৃ. ৩২৪
১৭। তদেব, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪
১৮। তদেব, পৃ. ৩৪৭
১৯। তদেব, পৃ. ৩৭১-৩৭২